সমিরন

সৈয়দ শামসুল হক

গোলাম মোস্তফার কথার নাড়চড় কোনোদিন হয় না। মৃত্যুকালেও হয় নাই। জল্মেরী বাজারে তার শাড়ির দোকান। তাদের খদ্দের সকলে, টাউনের মানুষ সকল, পাড়াপড়শি, সকলেই জানে মোস্তফা এক কথার মানুষ। এই শাড়ি টাঙ্গাইলের তো টাঙ্গাইলেরই। এই শাড়ি পাঁচশো পঁচাত্তর তো পাঁচশো পঁচাত্তরই। মোস্তফার দোকানে কথাও পাকা, জিনিসও পাকা। দাম ও এক দাম। খদ্দের বুঝে বাকিও দেও সে। কিন্তু বাকি শোধ ঠিক টাইমে করা চাই। তাই বলে মন তার শক্ত নয়, যদিও বাইরে তার ভাবগম্ভীর লম্বা দাড়ি, শোভন মুখ দেখে অচিরে তা ঠাহর হয় না। যদি শোনে মেয়ের জন্য প্রথম শাড়ি কিনতে এসেছে, বলার আগেই বিশ পঞ্চাশ টাকা কম রাখে। যদি দেখে, কোনো নারীর শাড়িটা পছন্দ খুব, কিন্তু টাকার টান! আমরা এমনও শুনেছি, শাড়িটা সে ওই টাকাতে দিয়েও দিয়েছে। আমরা যদি বলে উঠি, মুখের কথা বিশ্বাস করিলেন, চাচা? মোস্তফা বলে, জবান যদি কাঁইও খারাপ করে তো হিসাব দিবে তাঁই হাশরে!

এক সময়ে মোস্তফার দোকানই ছিল জল্মেরীর একমাত্র শাড়ির দোকান। ঈদে পরবে ভালো শাড়ি খোঁজ করছেন? মোস্তফার দোকান! বিবাহের বেনারসি চাই? মোস্তফার দোকানে চলো! হাতে টাকা নাই মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। বাকিতে শাড়ি পাওয়া যাবে মোস্তাফার কাছে! বাজারে এখন নতুন অনেক শাড়ির দোকান হয়েছে। সেসব দোকান আলোয়, আয়নায় ঝলমল করে। ফিটফাটযুবক দোকানিরা নিজ দেহে শাড়ি জড়িয়ে ঢং করে দাঁড়ায়। কিন্তু মোস্তফার দোকান সেই সাবেক কালের। শান বাঁধা উঁচু মেঝে। তার ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। আর সকল দোকানের শোকেশে শাড়ি কাচের ঘেরে ঝরনার মতো শাড়ি ঝোলানো। মোস্তফার দোকানেবড়ো বড়ো ড্রায়ার - বন্দী শাড়ি। কী চাই, শুনে তবে শাড়ি বের করে মোস্তফা। শাড়ির পর শাড়ি মোস্তফাই মেলন করে ধরে চাদরের ওপর। পুষ অঙ্গে শাড়ি জড়ানোর মতো বাচালতা তার কাছে নেই। শান বাঁধানো চত্তরটাই ফুলের বাগান হয়ে ওঠে শাড়িতে শাড়িতে।

মোস্তফার দোকানে আগে জ্বলত হ্যাজাক, এখন ইলেকট্রিকের বাতি। কিন্তু আর সব দোকানের নতো সে আলো তেজি নয়। খদ্দেরদের বসার জন্যে গদি - আঁটা বেঞ্চি বা চেয়ারও তার দোকানে নেই। চত্বরের ওপরেই থেবড়ে বসতে হয়। তবু তার দোকানে এখনো সেই আগের মতোই ভিড়। মোস্তফার কথা, খরিদ্দার টানি আনে ইলেকট্রিকের লাইট নয়, শোকেসের ভুজুং ভাজাং নয়, খরিদ্দার আসে মহাজনের ব্যবহার দেখিয়া! মোস্তফার ভদ্র ব্যবহার কাক পক্ষীও জানে। এটা কাব্যকথা নয়! তার দোকানের সামনে ইলেকট্রিকের তারে নির্ভয়ে দলে দলে কাক বসে। মোস্তফা তাদের মুড়ি ছিটিয়ে দেয় দু-বেলা। তার সত্যবাদিতার কথাও টাউনের নারীসকল জানে। ইন্ডিয়ার শাড়ি বলে বাংলাদেশের শাড়ি সে ঈশ্বরে বাজারে বিত্রি করে না।

মোস্তফার শাড়ির দোকান সেই পাকিস্তান আমলের। সেই সেবারের কথা, আমাদের তখন জন্মও হয় নাই। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা নিল, মোস্তফাও শাড়ির দোকান দিল জল্মেরীর বাজারে। পাক শাড়িঘর। দোকানের মাঝখানে পাকা কাঠের থাম। সেইথামে ঝুলল আইয়ুব খানের ফটো। তারপর চান্দে চান্দে কত পূর্ণিমা অমাবস্যা যায়। বাংলাদেশ হয়। তখন কিছু নড়চড় হয়। দোকানেরনাম বদল হয়। 'মুক্তি শাড়িঘর'! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোস্তফা দেখে, নামটির ভেতরে যেন মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ। শহরের কোনো কোনো মানুষ আর তার দোকানে আসে না। তখন সে আরো একবার নাম বদল ঘট

ায় দোকানের। 'নব শাড়িঘর'।

মোস্তফা বলে, নবই তো বাহে, নব কালে নব দোকান, নব শাড়িঘর। আমরা যদি বলি, মুক্তিযুদ্ধটা তবে আপনিও অস্বীকার করিলেন, চাচা? মোস্তফা বলে, রাজনীতির আলোচনা তোমরা করেন, হামাকে হামার দোকান করিবার দ্যান! কিন্তু এ-গল্প রাজনীতির নয়। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কে পক্ষে আর কে বিপক্ষে সে - অবতারণা এই গল্পে নয়। এই গল্প মোস্তফার মৃত্যুকালে তার একটি কথার সূত্রেএই গল্প শাড়ির মতো মেলন হবে আশা করি। শাড়ির অপর পিঠেনকশার মফস্বলটি থাকে আড়ালে। প্রকাশ্যে তা দেখার নয়। কিন্তু সেই নকশার অপর পিঠই থাকে অঙ্গের অধিক কাছে, একেবারে গাত্রস্পর্শ করে। শাড়ি যে পরে, সে শুধু বোঝে। এ- গল্পের সমাপ্তিও কেবল মোস্তফার কাছেই সত্য হয়ে থেকে যাবে। জগতের পৃষ্ঠএখনো আমরা যারা আছি, আমরা কেবল নকশার সদরটাই দেখি।

আমরা দেখতে পাই, মৃত্যুকালেও মোস্তফার কথার নড়চড় নেই। সে যা বলেছিল তা-ই হয়। আমার আয়ু ঠিক ঠিক চাইর-কুড়ি বচ্ছর! সাবেকি সেই কুড়ি হিসাবে মোস্তফা কখনো ভোলে নাই। দোকানের আয় আমদানি জমাখরচ হাজার কি লাখের হিসাবে সে করে বটে, মুখের কথায় কুড়ির হিসাব তার বড়ো স্বচ্ছন্দে ফোটে। চার কুড়ি বছরের অধিক সে বাঁচবে না, এই একথা তার মুখে আমরাও অনেকে শুনেছি। আমরা জানি, কুড়ির হিসাবে যারা সংখ্যা গোনে তারা চার কুড়ির অধিক হিসাব করতে পারে না। জল্পেরীতে এ আমরা এখনো বহু বুড়াবুড়ির ভেতরে দেখতে পাই। আমরা ধরে নিই, চার কুড়ি বছরই সে মাত্র বাঁচবে, মোস্তফার এ-কথাটি কুড়ির হিসাব চার পর্যন্ত বলেই। কিন্তু একদিন সত্যি নব শাড়িঘরের গোলাম মোস্তফা চার কুড়ি কিনা আশি বছর পুরো করেই এ-জগত থেকে বিদায় নেয়।

মৃত্যুকালে কোনো যন্ত্রণা হয় নাই তার। রোগভোগও এমন কিছুই নয়। তিনদিনের জ্বর শীতের কাল, বুড়া মানুষের জ্বরজারিহওয়া এ-সময়ে আশর্চ্য কিছু নয়। বাড়ির কেউ মোস্তফার জ্বরটাকে আমলেও আনে নাই। ভাতের বদলে চিনি দিয়ে টির ব্যবস্থা মাত্রহয়। শরীরও এমন কিছু টসকায় নাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও তার কাজ হয় নাই। ভরাভরতি সংসার তার। পাঁচ বেটা, তিন বেটি। দুইবেটা তো বাড়িতেই বাস করে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। বেটিরাও কোনো দূরবর্তী টাউনেও নয়। জল্পেরীতেই তারা। জ্বর এতই সামান্য,বেটি আর জামাইদের খবর দেবার দরকাও কেউ মনে করে নাই। বেটারাও যে যার ধান্দায়। একজনের মনোহরি দোকান, একজনের আলুপটলের পাইকারি কারবার, একজন লেবারের সরদার, বাকি দুইজন বাপের নব শাড়িঘরেই কাজ করে।

মৃত্যুর আগের রাতে মোস্তফা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বেটাবেটির খোঁজ করে। তারা কই? কোন্ঠে তারা? মোর সময় যে আর নাই! এ-কথায় সকলেই মনে করে, বুড়ার মৃত্যুভয় ছাড়া আর কিছু নয়। সমান্যা শীতের জ্বরে কী মানুষের এন্তেকাল হয়? রাত বড়ো অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কাটে। এক কুড়ি বছর আগে মোস্তফার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত, তবে সে নিশ্চয় টের পেত, স্বামীর এখন শেষ সময়। তার চেয়ে ভালো আর কে জানত যে মোস্তফার যে - কথা সেই কাজ। কতবার এর প্রমাণ সে পেয়েছে। হায়, আজ সেনাই!

তবে, বেটারা ফজর কালেই ছুটে আসে। ছোটো বেটা মজিদ গিয়ে প্রথম খবর দেয় বড়োভাই বশারকে। বশারের বাড়ির পাশেই বড়ো বোন পালের বাড়ি। পালকে নিয়ে সে বাপের কাছে আসে। আর সব বেটা বেটি জামাইরাও এসে যায়। তখনো ফজরের জামাতা বাজার মসজিদেও ভাঙে নাই। শয্যাগত গোলাম মোস্তফা বিস্ফারিত চোখ মেলে বেটাবেটি জামাই প্রত্যেকের মুখ দেখে। তারা সকলেই ঝুঁকে পড়ে বারবার বলে, বাপজান, কোন্ কষ্ট কন! এত কেনে উতলা হন? মোস্তফা এ - সব প্রশ্ন বা সান্ত্বনার কথা কানেওনেয় না, জবাবও দেয় না। একটিও কথা সে বলে না। তখন বেটাবেটিদের ভয় হয়, এবার বিশ্বাস যেন হয়, মৃত্যু তার আসন্নই, জবান তাই বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রমে তার চোখ ছটফট করে ওঠে। একবার ঘরের ছাদের দিকে উলটে যায়, একবার দরোজায়। বেলা বাড়তে থাকে। ঘরের সাবেকি দেয়ালঘড়িতে সকাল আটটায় ঘন্টা বেজে ওঠে। অকস্মাৎ মোস্তফার স্বর ফোটে, ঘরঘর অস্পষ্ট সে - কথা। মৃত্যুপথগামী মানুষের চাপা বিকট সে স্বর। বালিশ থেকে ঈষৎ ব্যগ্রতায় মাথা তুলে মোস্তফা বলে ওঠে, মনে পোড়ায়! সমিরনকে খবর দিও!

তারপর তার মাথা ঢলে পড়ে। মুহূর্তের ভেতরে চোখ ঘোলা হয়ে আসে। বড়ো বেটা বশার বাপের চোখের পাতায় হাত রাখতেই চোখের পাতা পড়ে যায়। মোস্তফা তার কথা রাখে। চার কুড়ি বছর পুরো করে সে এ-জগত থেকে চলে যায়। বড়ো বেটি পাল আছাড় খেয়ে বাপের বুকের ওপর ভেঙে পড়ে। আর বেটা বেটিরাও ডুকরে ওঠে। ঘরময় কান্না আছড়ে পড়ে।

কিন্তু জামাইদের তরফে কোনো শব্দ ওঠে না। জামাইদের মুখে আমরা ঘোর ভ্রুকুটি লক্ষ করে উঠি।
এ এমন নয় যে, মানুষজনের সেই প্রচলিত কথা -- যম জামাই ভাগনা, এই তিন নয় আপনা! অতএব জামাইরা শ্বশুরের মৃত্যুতে কাঁদছে না! আসলে জামাই তিনটিই খুব ভালো পেয়েছিল মোস্তফা। বড়ো সম্মান করত তার শ্বশুরকে। কিন্তু তিন জামাইয়েরই মনে এখন অভিন্ন এক বিষম খটকা। বেটাবেটি না হয় বাপের সিথানে আজরাইলের ছায়া দেখে তরাসে কিছু ভালো করে শোনে নাই, তারা তো শুনেছে। এ কী শুনল তারা! মন পোড়ায়? মন পোড়ায় মনে কী? কার জন্যে পোড়ায়? সমিরণ? কে এই সমিরণ?
কিন্তু নগদ কাজ হাতে। এ - সকল কথার অবকাশ নাই। কাজও কী কম ? লাশের ঘোসল, কাফনের জোগাড়, জানাজা, দাফন। খবরও দিতে হয় বাজারে। গোসলের জন্যে মাতববর মানুষ খোঁজ করো। কুতুবুদ্দিনের মাজারের খাদেম সাহেবকে তালাশ করো, জানাজা তিনি পারবেন। এর ফাঁকে গোরস্তানে পছন্দ করা চাই। তারপরে আছে গোর খোদা। বাঁশের জোগাড়। আছরের আগেই মাটি হওয়া চাই। লাশ বিলম্ব করা ঠিক নয়। বড়ো জামাই পালের স্বামী আকমল মোস্তফার বড়ো বেটা বশারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।
তারপর ভালোভাবে সকলই শেষ হয়। জানাজাতেও বাজার ভেঙে মানুষ হয়। হো হো করে কাঁদে অনেকেই। মোস্তফার বিষয়ে ভালো ভালো কথা বলে প্রাচীনেরা। বাইরের মানুষ বড়ো আপশোস করে মানুষটার জন্যে। কিন্তু বাড়ির মানুষের কাছে ওই কথাটা শেষ হয় নাই। মন পোড়ায়! সমিরনকে খবর দিও!
গোরস্তান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই বড়ো জামাই বলে ওঠে, আববা এ - কেন সমিরনের কথা কয়া গেইল হে! তার জন্যে বলে মন পোড়ায়! এ বড়ো কেমন কথা!
ছোটো জামাই শিমুলের স্বামী বলে, আরে নয় নয়! মুঁই ভাবিয়া দেখিছোঁ। সমিরণ নামে শাড়ি বাইর হইছিল ঢাকা হতে। নারী সকলের বড়ো পছন্দের শাড়ি। শাড়ির দোকানদার তো! সেই সমিরণ শাড়ির কথা আববাজান ভুলিবার পারে নাই? মাঝের বেটি বকুলের স্বামী শ্বশুরের প্রতি বড়ো ভক্তিমান। অবসরে গল্পের বই কবিতার বই দু-একখানা পড়ে। সে বলে, হবার তো পারে! কিন্তু এ-কথা নিয়া আন্দোলন না করো। আর কী কইতে কী কইছে আববা, তারে বা ঠিক কী ? জগত হতে যাবার সময় মানুষের মন পোড়ায়, এটা কোনো আচচয্যের কথা নয়। সমিরন মানে হাওয়া বাতাস। এ - সব কথা বাতাসে ভাসিয়া যাওয়া ভালো!
যতই সে হাওয়া বাতাস বলুক, কথাটা মিলিয়ে যায় না অচিরে। বরং দিনে দিনে পাথরের মতো ভারী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বড়ো বেটা বশারের মনে। সে অবাক হয়ে যায়, বাপের ওই শেষ সময়ে যদিও পরিবারের তারা ভিন্ন আর কেউ উপস্থিত ছিলো না, কথাটা কী করে বাজারে সবার কানে গেল! সব দোকানে, সব আড্ডায় ওই এক কথা। সমিরন! শাড়ির নতুন দোকানগুলোতে বিশেষ করে খুব হাসাহাসি কানাকানি চলছে। সমিরণ? আরে, খোঁজিয়া করি দ্যাখো, সমিরণ নামে রসের কেউ ছিল বুড়ার। বই তো কুড়ি বচ্ছর আগে কববরে গেইছে। তা বলিয়া বুড়ার রস তো আর মনের নাই। রস ঢালিবে কোথায়? দ্যাখো কাউকে খুঁজিয়া নিছে। তারে নাম সমিরন!
জামাই তিনজন বাড়িতে এই বিবরণ দেয়। বউদের তারা জিগ্যেস করে, বাপের কোনো অচাল-কুচাল কী তারা লক্ষ করে নাই? পাল বকুল শিমুল মোস্তফার তিন বেটি শরমে মরে যায়। তারাও তো স্পষ্টই শুনেছে বাপের মুখে কাতর কিন্তু মায়া মাখানো সেই নামটির উচচারণ। সমিরন! হতভম্ব তারাও। কার কথা কয়া গেইলো রে বাপজান?
বড়ো বেটা বশার দোকানে গিয়ে ছোটো দুই ভাইকে ধরে। এ রে, হাশেম! সমিরণ বলি কাউকে চিনিস?
হামেশ মাথা নাড়ে। না, সে চেনে না। হামেশের ওপরের ভাই কাশেম, সেও বলে, না! সমিরন বলে কাওকে তো চেনোঁ না! বশার ধমক দিয়ে ওঠে, দোকানে তোরা বাপজানের সাথে এতকাল! মনে পড়ে না নারী কোনো কী ঘুরি ঘুরি দোকানে আসিত?
দুই ভাই একসঙ্গে বলে উঠে নারী যারা আসিত তারা বাপজানের নাতির বয়স। নামও তাদের আপ টু ডেট। সমিরন নামটা তো তোমার আগিলা কালের নাম। এগুলো কথা পুছ করাও ঠিক নয়।
বশার বলে, তবে যে বাজারে এই নিয়া পাঁচ কথা হইচেছ, তার কী ? তোরা কিছু শুনিস নাই?
এ-কথার পিঠে জীবনযাত্রার এক ঘোর কথা বলে ওঠে কাশেম, কত লোকে কত কথায় তো কয়! বাজারের কথা কান

দেওয়া ঠি নয়। তদুপরে চল্লিশ দিনও পার হয় নাই বাপজানের এন্তেকাল হইছে। এই সকল আন্দোলন যারা করে তারা মুখ নয়।

কিন্তু মানুষ তাই বলে চুপ করে থাকে না। ত্রমে কথাটা ঘন পল্লবিত হয়ে ওঠে। নান বিচিত্র কাহিনী ছড়ায় বাজারে।

কেউ বলে, সমিরন ছিল মোস্তফার গোপন প্রণয়ী।

কেউ বলে, শাড়ির নাম সমিরন।

সুপারির ব্যাপারী এক মহাপণ্ডিত বলে, সমিরনকে খবর দিয়ো নয়, কথাটা আসলে হইবে কমির অঙ্কে খবর দিয়ো। শাড়ি বিত্রির অঙ্গ কষি যদি দেখা যায় লাভের ভাগ কম, তবে সেই কমির খবর অবিলম্বে দিবার কইছে!

কেউ এক নতুন ব্যাখ্যা দেয়। আরে, তাজহাটের মহারাজার হাতির নাম ছিল সমিরন! সে হাতিত চড়ি তাঁর আল্লার দরব ারে যাইবে বিল শখ! কথায় আছে না, গরিম আমি হরিণ খাই, হাতিত চড়ি হাইগতে যাই!

আমরাও নানা অনুমান শুনি। নানা কথা। কত কথা। এ বড়ো নষ্ট সময়। দুষ্ট কথার আলোচনায় মানুষের এখন বড়ো উৎসাহ। অতীত না বিচার, বর্তমান না বিশ্লেষণ, মানুষকে একবার কোনোমতে মাটিতে আছাড় দিলেই কী যে সুখ মানুষের! গোলাম মোস্তফার পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ তলিয়ে যায়, রমজানের তিরিশ রোজা তলিয়ে যায়, যাকাতের উসুল মানুষ ভুলে যায়, মঙ্গার সময়ে তার দানখয়রাতের কথা বিস্মরণে যায়। রঙিলা মোস্তফার উদয় ঘটে বাজারের দোকানে দোক ানে। আমরা আমাদের জল্লেরী বাজারের ভেতরদিয়ে হাঁটি। আমরা যেন স্পষ্টই কানে শুনতে পাই গুঞ্জন, সমিরন! সমিরন! সমিরনকে খবর দিয়ো! মন পোড়ায় হে মন পোড়ায়! মোস্তফার মন পোড়ায়!

সমস্ত অনুমান, সকল গুজব আর বিপুল গল্পরাশি ভেদ করে এক নারীমূর্তি ওঠে। নাম তার সমিরন। নব শাড়িঘরের লাল শাড়ি তার পিন্ধনে। সেই নারীটি যে কে, তা কার জানা নাই। নির্ণয়ই নাই। তার চেহারাটিও স্থির কোনো মানুষের নয়। যে যার কল্পনায় গড়ে নেয় নারীটির মুখ। তারই আয়নায় যেন বাজারের গুজবে গল্পে তামাশায় ঠাট্টায় গোলাম মোস্তফা নতুন চেহারা পায়। তার শাদা দাড়িতে কলপ পড়ে। সুতির শাদা পাঞ্জাবি রঙিন হয়ে ওঠে। মাথার কিশতি টুপি হাওয়ার উড়ে যায়। তাকে কালী মন্দিরের পাশে মাগিপাড়ার দিকে হাঁটতে দেখা যায়। সেখানে সমিরন নামে কোনো বেশ্যা আছে কী নাই, ছিল কী ছিল না, বাজারের কাছে সেটা কোনো বিষয় নয়। বাজার তাকে গলির ভেতরে সমিরনের কাছে পাঠায়। মসজিদে তারাবির নামাজের ছুতায় গোলাম মোস্তফা এখন লোকের মুখে মুখে সমিরন মকাগির কোলে মাথা রেখে তার বগলে সুরসুড়ি দেয়। সমিরনের খিলখিল হাসিতে ভেসে যায় জল্লেরীর বাজার।

এন্তেকালের চল্লিশ দিন পরে বিরাট ফতেহার আয়োজন করে গোলাম মোস্তফার পাঁচ বেটা তিন বেটির জামাই। আমরাও যাই। মৃত্যুর শোক থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় তবে মহাভোজ! এই ভোজের অন্নগ্রহণ না করে আমরা জীবনের ভেতরে আবার প্রবেশ করতে পারি না। প্রবেশ করে বাজারের দোকানিরা, মহাজন সকল, প্রবেশ করে জগৎ। ফতেহায় গর ঝাল গোশত আর শাদা পোলাও, বুটের ডাল আর মিঠা দই, রগরগে রসালো করে তোলে আমাদের। এখন যদি নিতান্ত আমরা শোক থেকে, তবে আর এত ঢাকাঢাকি চাপাচাপি কেন হে? টিউবওয়েলের পানিতে খলবল করে হাত ধুতে ধুতে, হাতের আঠালো চর্বি সাবানে সরল করতে করতে মৌসুমি শাড়িঘরের যুবক মালিক সর্বজনের শোনার মতো করে বলে, আমার কাছে নিশ্চয় সম্বাদ আছে! কুড়ি বছর আগে বউ মমি যাবার পর বহুদিন হতেই মোস্তফা চাচা মাগিপাড়ায় যাইত সমিরনের ঘরে।

আমরা শুনেছি, চল্লিশ দিন পরে আত্মা এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। চল্লিশ দিন কবরের মাটির সিন্দুকে থাকে ম ানুষ। মুনকির নাকির তাকে উর্দুতে পুছ করে, বোল্ তেরা বর কৌন? বাসুল কৌন? বর আমার আল্লা, লা শরিক আল্লা, রাসুল আমার মোহাম্মদ মুস্তাফা। জবাব পেয়ে ঠাণ্ডা হয় মাটি। তারপর মাটির গোর সেই সিন্দুকের দরোজা খুলে যায়। বেহেশতের বাগান থেকে মিঠে হাওয়া আসে।

কাফন জড়ানো গোলাম মোস্তফা উঠে বসে। তার স্মরণ হয়, এক কুড়ি বছর আগে স্ত্রীকে সে এই তো পাশেই কবর দিয়েছিল। তার সেই মাটি সিন্দুকের দরোজা সে খোলা দেখতে পায়। সে পাশের কবরে হামাগুড়ি দিয়ে যায়। ঘুম থেকে ডেকে তোলে স্ত্রীকে। এক কুড়ি বচ্ছর হয়া গেইলো, ঘুম যান এলাও? তারপর খলখল করে হাসতে হাসতে চল্লিশ দিনের মুর্দা গোলাম মুস্তফা বলে, হা রে, বশারের মা, কাণ্ড কী দেখিছিস? বশার হইল বাদে তোকে সবায় বশারের মা বলিয়া ড

াকে। পাল হইল বাদে নারীরা তোকে পালের মা বলিয়া বোলায়। মুইও একবার বশারের মা একবার পালের মা বোল াইতে বোলাইতে তোর আসল নাম বিস্মরণ হয়া যাই। জগত যে বিস্মরণ হইবে ইয়াতে আর আচচয্য কী, সমিরন!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com